জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

বাংলাদেশের আবৃত্তিচর্চার ধারা

নিমাই মণ্ডল*

Abstract

The practice of any form of art can occur in different patterns. Through various patterns of practice, a particular art progresses, flourishes and attains newer dimension. The practice of recitation in post-independent Bangladesh can also be divided into several patterns. This article highlights and analyzes the country's major patterns of recitation-practice, as well as sheds light on how the multi-layered practices have enriched the art of recitation in Bangladesh.

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যেসব প্রয়োগশিল্পের সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটেছে তার অন্যতম হলো আবৃত্তি। নদীর দুকূলপ্লাবী গতিশীল বিপুল জলরাশির মতো আবৃত্তি দেশের সমস্ত অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবৃত্তিচর্চা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও গড়ে উঠেছে আবৃত্তি-সংগঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবৃত্তির চর্চা বেড়েছে এবং প্রতিটি গণমাধ্যমেও আবৃত্তির প্রচার সম্প্রসারিত হয়েছে বহুগুণ। এই যে নানাধারায় আবৃত্তি, এসবই আবৃত্তিশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে, কবিতাকে জনসম্পৃক্ত করেছে এবং মানুষের মধ্যে সুন্দর শব্দচয়নের মাধ্যমে শুদ্ধ উচ্চারণে ও আবেগে কথা বলার ইচ্ছাকে পরিবর্ধিত করেছে। বাংলাদেশে আবৃত্তিচর্চার বিভিন্ন ধারার বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিকভাবেই এই ভূখণ্ডে স্বাধীনতা-পূর্বকালের আবৃত্তিচর্চার ইতিহাস কিছুটা জেনে নেয়া যাক।

ত্রিশের দশকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশিত হতো। পুরুষ শিল্পীরাই শুধু এসব অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতেন। মঞ্চে শব্দযন্ত্রের ব্যবহার না থাকায় শিল্পীরা তখন উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি পরিবেশন করতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তির প্রচলন ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানগুলোতে তখন নারীশিল্পীরা অংশ নিতেন। ঢাকাতে তখন কোনো প্রচারমাধ্যম গড়ে ওঠেনি বিধায় মঞ্চই ছিল আবৃত্তি পরিবেশনের একমাত্র মাধ্যম। বকুল চৌধুরী, রমণীমোহন মজুমদার, কাজী মোতাহারুল হক, যামিনীকান্ত লাহিড়ী (ফরিদপুর), লোহিতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (খুলনা) প্রমুখ ছিলেন সে-সময়ের খ্যাতিমান আবৃত্তিকার।[১] ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া রেডিও 'ঢাকা ধ্বনিবিস্তার কেন্দ্র' অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করলে এই কেন্দ্রের শিল্পীদের নিয়ে চল্লিশের দশকে আবৃত্তির একটি আলাদা পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রধানত অবস্থাপন্ন সাহিত্য অনুরাগী বা বিভিন্ন শ্রেণি অবস্থানের সাহিত্যসেবী মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক এবং কখনো কখনো আনুষ্ঠানিক পরিসরে আবৃত্তির প্রবণতা দেখা যেত। সেই আবৃত্তি প্রবণতায় আবৃত্তিকে কোনোভাবেই বিশেষ ধারা বা শিল্পসম্ভাবনায় প্রবাহিত করার সচেতন প্রয়োগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও এরই ধারাবাহিকতায়

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কোর্স, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অভিনয়শিল্পীরা একসময় আবৃত্তিকে তাদের পেশা ও শখের সাথে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক খুঁজে পান। ফলে অভিনয়শিল্পীরা আবৃত্তিকে এবং নিজেদেরকে বিশেষ করে শৌখিনভাবেই উপস্থাপন করতে থাকেন। অন্যদিকে স্কুল পর্যায় থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাহিত্যের শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে আবৃত্তির প্রবণতা সমাজে আবৃত্তির জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। উল্লেখ্য এই শিক্ষকদের অনেকেই ছাত্রদেরকে তাঁদের আবৃত্তি দিয়ে মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন এবং অনেককেই আবৃত্তির প্রতি অনুভূতিশীল করে তুলতে পেরেছিলেন। তখন স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নজরুল জয়ন্তী, মহররম, বিদায় অনুষ্ঠান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক আয়োজনে আবৃত্তি একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হতো।[২] তখনকার আবৃত্তি পরিবেশন সম্পর্কে জানা যায়:

> রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবসে (১৪ আগস্ট) বিশেষ করে টাউন হলে আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী, মহররম, এবং এরকম অন্যান্যপর্বের বিচিত্রানুষ্ঠানে আবৃত্তি, গান, নাচ, নাট্যাংশ, কৌতুক, জাদু ইত্যাদির পাশাপাশি আবৃত্তিও পরিবেশিত হতো। এর পাশাপাশি গামে ও শহরতলীতে আবহমান বাংলার ছড়া, পাঁচালি, পুথি, কবিগান হাটে-বাজারে, বাড়ির উঠোনে কখনো খোলা গলায়, কখনো বাদ্যসহকারে পরিবেশিত হতো। শহর ও উপশহরগুলোতে পথে, ঘাটে, আদালত প্রাঙ্গনে এবং হাটবাজরে ছোট ছোট জমায়েতে গ্রাম থেকে আগত কবিস্বভাবীরা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন করতেন। শ্রোতা-দর্শক এসব উপস্থাপনা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।[৩]

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের পর প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানমালায় আবৃত্তি একটি প্রধান প্রতিবাদী বিষয় হয়ে ওঠে। মঞ্চে, রাস্তায়, মোড়ে, মহল্লায়, মফস্বলে, বিভিন্ন অঞ্চলে শহিদ মিনারে আবৃত্তি জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ষাটের দশকে বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা আন্দোলনের সময় রবীন্দ্ররচনা পাঠের মধ্য দিয়ে সুধীসমাজে আবৃত্তি ব্যাপক মর্যাদা লাভ করে। মুনীর চৌধুরী, লিলি চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, হাকিম ভাই (আব্দুল হাকিম), রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ওয়াহিদুল হক, গোলাম রব্বানী, মাকসুদুস সালেহীন, সনজীদা খাতুন, কাফী খান, তারিক সালাহউদ্দিন মাহমুদ, রাশিদা জামান, মাসুমা খাতুন, কামাল লোহানী, সেলিনা বাহার জামান, জাহানারা নওশীন, কাজী মদিনা, ইকবাল বাহার চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, নাজিম মাহমুদ, শামসুর রাহমান, খান আতাউর রহমান, তারিক সালাউদ্দিন মাহমুদ, আনোয়ার হোসেন, আসাদ চৌধুরী, ফরহাদ খান, জিল্লুর রহমান, আবেদ খান, আশফাকুর রহমান খান, আশরাফুল আলম, মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, আলেয়া ফেরদৌসী, হাসি সিদ্দিকী, কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী প্রমুখ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য আবৃত্তিকার।[৪]

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা কবিতা নতুন বাঁক নেয়। এই আন্দোলনে আপামর জনসাধারণের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে ওঠে, যার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় সেসময়ের সৃষ্ট বাংলা কবিতায়। যেসব কবিকে এ ধারায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় তাঁরা হলেন মাহবুবুল আলম চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, শামসুর রাহমান প্রমুখ। এইসব কবিতা ভাষা আন্দোলনের সময় যতো না আবৃত্তি হয়েছে তার থেকে পরবর্তী সময়ে পুরো ষাটের দশক জুড়ে একুশে উদ্‌যাপন, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে জনগণমুখী সাংস্কৃতিক আয়োজন এবং গণপ্রতিরোধ পর্বে অনুপ্রেরণার বাহন হিসেবে বহুল উচ্চারিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের আবৃত্তিতে ভাষা আন্দোলন ও ষাটের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং অর্জন একটি প্রধানতম

অনুপ্রেরণা এবং সার্বিক আবৃত্তিচর্চার গতিপথ নির্ধারক চেতনা হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।[৫]

১৯৬৬–১৯৭০ সালে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সময় গণমানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আবৃত্তি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এ-প্রসঙ্গে একজন খ্যাতিমান আবৃত্তিশিল্পী ও অভিনেতা বলেন:

> ষাট বছর আগে আবৃত্তি ছিল মূলত ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের বিষয়। '৫২, '৫৪-র সময় আবৃত্তিকাররা আবৃত্তি করতেন। তবে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রথম প্রবল ভূমিকা নিলো আবৃত্তি। '৭১-এ দেশকে স্বাধীন করার জন্যে বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজের পক্ষে এবং সারাদেশের আবৃত্তিকাররা আবৃত্তিকে হাতিয়ার হিসেবে নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। তখন সিকান্দান আবু জাফরের 'বাংলা ছাড়ো'সহ অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধের ও প্রতিবাদী কবিতা আবৃত্তি করেছে আবৃত্তিকারেরা।[৬]

১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের অনুষ্ঠানমালায় এবং দেশব্যাপী উদ্দীপনামূলক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে, স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতায় 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র (সভাপতি: সন্‌জীদা খাতুন, সম্পাদক: মাহমুদুর রহমান বেণু) অনুষ্ঠানে এবং 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' থেকে প্রচারিত প্রায় প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি জাগরণের মন্ত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।[৭]

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আবৃত্তিচর্চা আরও জোরদার হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জাতীয় দিবসে আবৃত্তি পরিবেশিত হয়েছে, আবৃত্তি কর্মশালা চালু হয়েছে, আবৃত্তি সংগঠন তৈরি হয়েছে ইত্যাদি নানাভাবে আবৃত্তি অগ্রসর হয়েছে। এমনিভাবে সারা বাংলাদেশে যে ব্যাপক আবৃত্তিচর্চা চলছে তাকে প্রধানত চারটি ধারায় ভাগ করা যায়:

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা
সাংগঠনিক পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা
ব্যক্তি পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা
গণমাধ্যম পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলা একাডেমি, নজরুল ইন্সটিটিউট এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রেই প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকায় নিয়মিতভাবে বেশকিছু আবৃত্তির অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং উৎসবের আয়োজন করে। বিভিন্ন কবির জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে আবৃত্তি পরিবেশনেরও ব্যবস্থা করে। জাতীয় দিবসগুলোতে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে গান-নাচের সাথে আবৃত্তিও রাখা হয়। তবে এখানে এককভাবে কেবল আবৃত্তির প্রযোজনা বা আবৃত্তিকারদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দুই-তিনজনের আবৃত্তি দিয়ে যুগের দাবী পূরণ হবে না। শিল্পকলা একাডেমিকে কেবল ঢাকায় নয়; জেলাভিত্তিক কাজ করতে হবে। তাহলে আবৃত্তি বাংলাদেশের সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সহায়ক হবে।[৮]

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বেশ কয়েকটি সফল আবৃত্তি উৎসবের আয়োজন করেছে। আবৃত্তি শিল্প বিকাশে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এই ধারাবাহিক উৎসবগুলো নিঃসন্দেহে মহতী উদ্যোগ। উৎসবগুলোতে বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ সার্বিক সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ২০১১ সালে স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তিতে 'স্বাধীনতার ৪০ বছর ও শিল্পের আলোয় মহান মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেশ কিছু কবিতা-সংকলন এবং আবৃত্তির সিডি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আবৃত্তিশিল্পীদের বহুদিনের দাবির বাস্তবায়ন ঘটিয়ে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আবৃত্তি বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এ বিভাগের নতুন নামকরণ করা হয় সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ। তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু আনুষ্ঠানিকভাবে আবৃত্তি বিভাগের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আহ্কাম উল্লাহ্। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনাপর্বে অংশগ্রহণ করেন সংস্কৃতি সচিব রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এবং বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সভাপতি আসাদুজ্জামান নূর প্রমুখ। এ উপলক্ষে সংগীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে বসেছিল আবৃত্তিশিল্পীদের মিলনমেলা। বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত আবৃত্তি অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করা হয় 'বাংলাদেশ আগুনলাগা শহর আর লক্ষ গ্রাম'। অতিথিরা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রযোজিত দুটি নতুন আবৃত্তি অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে একক আবৃত্তি করেন আশরাফুল আলম, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডালিয়া আহমেদ, লায়লা আফরোজ প্রমুখ। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আবৃত্তি বিষয়ক কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমিও নিয়মিতভাবে বেশকিছু আবৃত্তির অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, প্রতিযোগিতা, উৎসব ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। ঢাকায় কেন্দ্রিয় কার্যালয় ছাড়াও ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি উপজেলায় শিশু একাডেমির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। শহিদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ইত্যাদি বিশেষ দিনগুলোতে শিশু একাডেমি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আবৃত্তিতে উত্তীর্ণদের নিয়ে ঢাকাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রদান করে শিশু একাডেমি। শিশুদের দুটি শাখায় ভাগ করে এইসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে গান-নাচের সাথে আবৃত্তিও পরিবেশিত হয় শিশু একাডেমিতে।

অমর একুশে গ্রন্থমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বাংলা একাডেমি আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একক ও দলীয় আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন কবির জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে আবৃত্তি পরিবেশনেরও ব্যবস্থা থাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানেও আবৃত্তি থাকে। এইসব অনুষ্ঠানে দেশসেরা আবৃত্তিকারেরা আবৃত্তি পরিবেশন করে থাকেন। প্রতিবছর বাংলা একাডেমির বেশিরভাগ কর্মসূচি একই থাকে।

কবি নজরুল ইন্সটিটিউট ২০১১ সাল থেকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা শুদ্ধভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকাতে আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করে। ইন্সটিটিউট নজরুলের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের জন্য নজরুল-কবিতার

আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন সময় নজরুল ইন্সটিটিউটে যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে আবৃত্তিও থাকে এবং দেশের বরেণ্য আবৃত্তিশিল্পীরা সেখানে আবৃত্তি পরিবেশন করে থাকেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ১৯৮২, ১৯৮৩ এবং ২০১৩ সালে আবৃত্তির ওপর প্রায় বছরব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করেছে। ১৯৮২ সালের মে মাসে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আবৃত্তি, পাঠ ও উচ্চারণের ওপর দশ মাস মেয়াদী এক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেন। বিশেষভাবে মনোনীত ২৬জন শিক্ষার্থী এই কর্মশিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে ইন্দিরা রোডে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নেতৃত্বে উচ্চারণ ও সংবাদপাঠ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যার তৃতীয় আবর্তনে আবৃত্তি যুক্ত হয়। এই কর্মশালার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আবর্তনের কয়েকজন অংশগ্রহণকারী মিলে প্রথম আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ১৯৮৬ সালে।

১৯৮৭ সালের মে মাস থেকে ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে 'ঘরোয়া আবৃত্তির আসর' শীর্ষক মাসিক কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে প্রতিমাসে একটি স্বাগতিক দল আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিভিন্ন সংগঠনের নবীন শিল্পীদের আবৃত্তি পরিবেশনের আহ্বান জানাতো। পূর্বনির্ধারিত কয়েকজন আবৃত্তি বিশেষজ্ঞ এবং উপস্থিত দর্শক তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশিত আবৃত্তির ওপর উন্মুক্ত সমালোচনায় অংশ নিতেন এবং নবীন শিল্পীদের ভুল সংশোধন করে দিতেন। সুধীজনের কাছে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিল এই কর্মসূচি।[৯] বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আবৃত্তি বিভাগ এখনও নিয়মিত আবৃত্তির প্রশিক্ষণ ও অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে।

সাংগঠনিক পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা

সত্তরের দশকে আমাদের দেশে ২/১টি আবৃত্তি সংগঠন গড়ে উঠলেও আশির দশকেই বাংলাদেশে আবৃত্তির সাংগঠনিক চর্চার শুরু। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে, প্রত্যেকটি জেলা শহরে, প্রায় প্রত্যেকটি উপজেলায় এখন আবৃত্তির সাংগঠনিক চর্চা শুরু হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আগে বাংলাদেশে আবৃত্তি সাংগঠনিক রূপ পায়নি। আবৃত্তিকার সংখ্যায়ও তেমন ছিলেন না, হতে গোনা কজন মাত্র। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামে আবৃত্তি যখন হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল, তখন আব্দুল হাকিম, বদরুল হাসান, গোলাম মুস্তাফা, হাসান ইমাম, মালেকা বেগম, কাজী মদিনা এমন অনেকেই প্রবল দেশপ্রেম নিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ভাষা আন্দোলনে, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পালনে, বৈশাখের আমন্ত্রণে, শরতে কি বসন্তে অথবা বর্ষামঙ্গলে– অর্থাৎ বাংলার নিজস্ব সংহতি রক্ষা এবং দেশের মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নানা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে, পল্টন ময়দান কিংবা আরমানিটোলা মাঠে, শহীদ মিনারে, চারুকলার বকুলতলায়, অবশেষে রমনার বটমূলে 'ছায়ানট'-এর বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছেন। স্বাধীনতার পর সত্তরের দশকের আবৃত্তিচর্চা সম্পর্কে একজন প্রবীণ আবৃত্তিকার জানাচ্ছেন:

> একই বছর অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে শেষদিকে মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে সংগঠিত হলো 'আবৃত্তি সংসদ'। বহিরাগত আবৃত্তিশিল্পী ও অনুরাগীদের অনেকেই এ প্রয়াসে যুক্ত হলেন। ... এ সংসদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদকের

> দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে-সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র দিলওয়ার হাসান। ...সম্মিলিত প্রয়াসে আবৃত্তিচর্চা বাংলাদেশে বুঝি এই প্রথম। আবৃত্তিকার নয় শুধু, বাচিক শিল্পী যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন– কাজী আরিফ, ক্যামেলিয়া, শফি কামাল, সালেক খান, মানিক মাহবুবুর রহমান, সানজিদা আখতার, প্রজ্ঞা লাবনী প্রমুখ। দেশের প্রতিষ্ঠিত আবৃত্তিশিল্পী ও চলচ্চিত্র অভিনেতা গোলাম মুস্তাফা এবং সৈয়দ হাসান ইমাম প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন, সাথে আবেদ খানও ছিলেন। ... টিএসসি ছিল এদের শ্রেণিকক্ষ, মিলনকেন্দ্র।[১০]

আশির দশকে আমাদের জাতীয় জীবনে যেমন রাজনৈতিকভাবে তেমন সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ঢেউ তুলেছিল প্রবল উচ্ছ্বাস। সেই সবই আবৃত্তি আলোকিত করেছে। তাই এ দশকেই মুক্তকণ্ঠ, কণ্ঠশীলন, স্বরিত প্রভৃতি সংগঠনের সৃষ্টি। আশির দশকের মাঝামাঝি 'স্বরশ্রুতি' আবৃত্তি সংগঠনের আবির্ভাব। স্বরশ্রুতির আগে মুক্তকণ্ঠ, কণ্ঠশীলন, স্বরিত নামে কয়েকটি সংগঠন থাকলেও তারা কেবল আবৃত্তিই করতো, উৎসব করার কথা চিন্তা করেছিল 'স্বরশ্রুতি'। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে স্বরশ্রুতি টিএসসি মিলনায়তনে প্রথম আয়োজন করেছিল 'জাতীয় আবৃত্তি উৎসব'। সর্বজনশ্রদ্ধেয়া জননীসাহসিকা সুফিয়া কামাল প্রথম আবৃত্তি উৎসব উদ্বোধন করেছিলেন। দু'দিনের এই আবৃত্তি উৎসবের বাংলাদেশের ৮টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিল আবৃত্তির প্রাচীনতম সংগঠন 'ছন্দনীড়'। ১৯৮৭ সালে দুদিন ধরে টিএসসিতেই 'দ্বিতীয় জাতীয় আবৃত্তি উৎসব' হলো। এবারে দেশের ১১টি আবৃত্তিগোষ্ঠী এবং পশ্চিমবঙ্গের নীলাদ্রিশেখর বসুর নেতৃত্বে আবৃত্তি আকাদেমী অংশগ্রহণ করেছিল।[১১] কিন্তু দ্বিতীয় জাতীয় আবৃত্তি উৎসব করার পর আদর্শিক দ্বন্দ্বে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল স্বরশ্রুতি। প্রতিষ্ঠাতা আলী রিয়াজ বিদেশে চলে যাওয়ায় স্বরশ্রুতির একটির দায়িত্বে রইলেন নাঈমুল ইসলাম খান, অন্যদিকে নেতৃত্ব দিলেন সাগর লোহানী। পরে দুটো উৎসব আয়োজিত হলো ঢাকায়, 'স্বরশ্রুতি'র ব্যানারেই। নাঈমুল ইসলামরা করলেন বৃটিশ কাউন্সিলে এবং সাগর লোহানীরা করলেন পাবলিক লাইব্রেরিতে। দুটোই জাতীয় উৎসব নামে ঘোষিত হলো। নাঈমুল ইসলামদের অনুষ্ঠানে এলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র মিত্র প্রমুখ। সাগর লোহানীদের উৎসব উদ্বোধন করলেন ফণী বড়ুয়া এবং প্রখ্যাত ঢাকী বিনয় বাঁশি। দুটো উৎসবই তিনদিনের হয়েছিল। পাবলিক লাইব্রেরির উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের 'ছন্দনীড়' আবৃত্তি সংস্থা এবং সঙ্গে এসেছিলেন ওই দলের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত আবৃত্তিকার উৎপল কুণ্ডু, সমীরণ ঢ্যাং প্রমুখ।

১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে স্বরশ্রুতি-র প্রথম 'জাতীয় আবৃত্তি উৎসব'-এর আগে ১৯৮৫ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রায় ২০টি আবৃত্তি সংগঠন নিয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ আবৃত্তি ফেডারেশন'। ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন ওয়াহিদুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী লাকী। ১৯৮৬ সালের শেষদিক থেকে ফেডারেশন কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

বাংলা নববর্ষ ১৩৯৪-এর শুরুতেই গঠিত হয়েছে বিশিষ্ট আবৃত্তিকারদের সমন্বয়ে 'আবৃত্তিকার সংঘ'। সংঘের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম এবং কোষাধ্যক্ষ কাজী আরিফ। আবৃত্তি ও অভিনয়জগতের তারকাশিল্পীদের সমন্বয়ে প্রথম থেকেই দর্শনির বিনিময়ে আবৃত্তি পরিবেশন আবৃত্তিকার সংঘের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

১৯৮৮ সালের ১৪ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত আবৃত্তি সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ'। সভাপতি ছিলেন পরপর দুইপর্বে ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় পর্ব

(১৯৯১) থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন আসাদুজ্জামান নূর। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রথম পর্বে সাগর লোহানী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে ইস্তেকবাল হোসেন। এরপর টানা দুই কার্যকালে হাসান আরিফ। ২০০৩ সাল থেকে পরপর চার কার্যকালে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন আহ্কাম উল্লাহ্। বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে সারাদেশের বহু আবৃত্তি সংগঠন এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী যেকোনো সক্রিয় আবৃত্তি সংগঠন-ই বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারে।[১২]

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ সারাদেশে আবৃত্তির সাংগঠনিক চর্চা ও বিকাশ চালিয়ে আসছে। এই দীর্ঘ পথচলায় বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে এবং আবৃত্তি-বিকাশে ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আবৃত্তি উৎসব, ওয়াহিদুল হক জাতীয় শিশু আবৃত্তি উৎসব, আবৃত্তি কর্মশালা, চার/পাঁচটি সংগঠনের দুজন করে উদীয়মান শিল্পীর পরিবেশনায় দ্বিমাসিক আবৃত্তি-অনুষ্ঠান 'জ্বালাও আলো আপন আলো', একাধিক সংগঠনের মূলত দুজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর পরিবেশনায় আবৃত্তি-অনুষ্ঠান 'এইতো জীবন এইতো মাধুরী', মানসম্মত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা এবং তিনজন শিল্পীর পরিবেশনায় আবৃত্তি-অনুষ্ঠান 'শব্দের সড়কে জীবন সাজাই', বিটিভি-তে ৩০ মিনিটের নিয়মিত মাসিক আবৃত্তি অনুষ্ঠান 'সুবর্ণ উচ্চারণ' ইত্যাদি কার্যক্রম। এছাড়া প্রতিবছর একুশের প্রথম প্রহরে গোলাম মুস্তাফা স্মরণ ও বিশেষ আবৃত্তি অনুষ্ঠান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান, একুশের অনুষ্ঠানমালা, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে এই সংগঠন। 'আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ-এর মাধ্যমে সারাদেশের আবৃত্তিকর্মী এবং সংগঠনসমূহ একটি প্লাটফর্মে মিলিত হওয়ার ফলে পারস্পরিক অনুষ্ঠান আদান-প্রদান, মত বিনিময়, যৌথ প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের কল্যাণে ব্রতী হওয়ার লক্ষ্যে আবৃত্তিকর্মীদের একমুখী চিন্তা প্রয়োগের ব্যাপক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।'[১৩] সারাদেশের আবৃত্তিশিল্পীদের চৈতন্যের প্রতিচ্ছবি বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ আজ প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা ও আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদভুক্ত সারাদেশে সক্রিয় আবৃত্তি সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলো সংগঠন হচ্ছে–

ঢাকা মহানগরী: কণ্ঠশীলন, কথা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র, মুক্তকণ্ঠ আবৃত্তি একাডেমি, স্বরিত আবৃত্তি চক্র, স্বরশ্রুতি, দৃষ্টি কেন্দ্রীয় সংসদ, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ, বৈকুণ্ঠ আবৃত্তি একাডেমি, স্বনন, স্রোত আবৃত্তি সংসদ, মুক্তধারা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ক'জনা, স্বনন ঢাকা, প্রকাশ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন, মুক্তক পদাবলী, স্বরবৃত্ত, মুক্তধারা আবৃত্তি র্চচা কেন্দ্র, স্বরকল্পন আবৃত্তি চক্র, আবৃত্তি অঙ্গন, স্বরশীলন আবৃত্তি একাডেমি, বিশ্ব কলাকেন্দ্র, আবৃত্তি একাডেমি, মুক্তবাক, চারুকণ্ঠ আবৃত্তি সংসদ, হরবোলা, ঢাকা স্বরকল্পন, সংবৃতা, নন্দনকানন, সৃজন, শব্দবৃত্তি, বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি একাডেমি, চারুবাক, বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি পরিষদ প্রভৃতি।

ময়মনসিংহ: শব্দ আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র, অনুপ্রাস, আবৃত্তি নিকেতন, উচ্চারণ আবৃত্তি সংসদ।

নারায়ণগঞ্জ: কথন, কণ্ঠমালা, শ্রুতি আবৃত্তি সংসদ, আবৃত্তি চক্র।

চট্টগ্রাম: বোধন আবৃত্তি পরিষদ, প্রমা আবৃত্তি সংগঠন, উদীরণ, অনার্য অন্যস্বর, মুক্তধ্বনি আবৃত্তি সংসদ, উচ্চারক আবৃত্তি কুঞ্জ, আবৃত্তি মঞ্চ (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), নির্মাণ আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র, অঙ্গন, ত্রিতরঙ্গ।

কুমিল্লা: আবৃত্তি সংসদ কুমিল্লা, মৃত্তিকা আবৃত্তি সংগঠন, তীর্থ আবৃত্তি সংগঠন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: তিতাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী আবৃত্তি পরিষদ, সুন্দরম শিল্পকলা একাডেমি।

রাজশাহী মহানগরী: স্বনন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী আবৃত্তি পরিষদ, সুন্দরম।

খুলনা মহানগরী: কিংবদন্তী আবৃত্তি পরিষদ, ওংকার-শৃণূতা, দ্রাবিড় (খুলনা)।

সাতক্ষীরা: সাম্প্রতিক আবৃত্তি সংসদ, প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংসদ।

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া আবৃত্তি পরিষদ, আবৃত্তি আবৃত্তি।

মাগুরা: কণ্ঠবীথি।

বরিশাল মহানগরী: বরিশাল নাটক, ব্রজমোহন থিয়েটার।

সিলেট মহানগরী: উর্বশী, কথাকলি, কণ্ঠধ্বনি আবৃত্তি চক্র (শ্রীমঙ্গল), মাভৈঃ আবৃত্তি সংসদ।

সংগঠনভিত্তিক আবৃত্তিচর্চা '৮০-র দশকে শুরু হয়ে '৯০-এর দশকের শুরুতে উত্তাল হয়ে ওঠে এবং '৯০ দশকের শেষ নাগাদ স্তিমিত হতে থাকে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যক্তি-শিল্পীকেন্দ্রিক আবৃত্তিচর্চা ভেঙে গিয়ে আবৃত্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে অর্থাৎ গণায়ন ঘটে আবৃত্তির। সেই সূত্রেই আমাদের দেশে অনেক আবৃত্তি-সংগঠনের সৃষ্টি এবং এইসব সংগঠন এখনো উজ্জ্বলভাবে কাজ করে চলেছে। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্র অনেকটাই বিকশিত হয়েছে এই দলগত চর্চার ফলে। 'আবৃত্তি যে আলাদা একটা শিল্পমাধ্যম হতে পারে, আশির দশকের এই সংঘবদ্ধ চর্চার ফলেই মানুষ এটা গোচরে নিয়েছে, তার পরে কবিরা এটা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, শ্রোতারা এটা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে।'[১৪]

'সাংগঠনিক আবৃত্তিচর্চার ফলে আবৃত্তিশিল্পী, প্রশিক্ষক, নির্দেশক, সাংগঠনিক কর্মী, সংবাদ উপস্থাপক, রিপোর্টার, অনুষ্ঠান উপস্থাপক এবং নাট্যকর্মীসহ অন্যান্য মাধ্যমের বেশ কিছু বাচিক শিল্পী সৃষ্টি হচ্ছে– যাঁরা ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও দেশের মানুষের কল্যাণে ব্রতী হয়েছেন। এঁরা সকলেই এক ভাষাভাষী মানুষকে মেলবন্ধনে আবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট।'[১৫] সাংগঠনিক আবৃত্তিচর্চার এটা অনেক বড় সাফল্য।

ব্যক্তি পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা

ব্যক্তিগতভাবে আবৃত্তিচর্চা করে ১৯৪৭ সাল থেকে যাঁরা এই ভূখণ্ডকে আবৃত্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: ফতেহ লোহানী, মৃণাল সরকার, কাফি খান, নিখিল সেন, ওয়াহিদুল হক, কামাল লোহানী, গোলাম মুস্তাফা, নাজিম মাহমুদ, সৈয়দ হাসান ইমাম, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, তারিক সালাহউদ্দিন মাহমুদ, কাজী মদিনা, নরেন বিশ্বাস, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, আসাদুজ্জামান নূর, কাজী আরিফ, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা লাবণী, কামরুল হাসান মঞ্জু, হাসান

আরিফ, শিমুল মুস্তাফা, মাহিদুল ইসলাম, আহ্কাম উল্লাহ প্রমুখ। এঁদের কয়েকজনের কর্মপ্রবাহ আলোচনা করে আমরা আবৃত্তিক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনুধাবনে সচেষ্ট হব।

গোলাম মুস্তাফা (১৯৩৫–২০০৩)

১৯৩৫ সালের ২ মার্চ পিরোজপুর শহরে গোলাম মুস্তাফা জন্মগ্রহণ করেন। "বেয়াল্লিশ সনে কোলকাতা বেতারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহালয়া' এবং পঁয়তাল্লিশ সনে কোলকাতা বেতারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'দেবতার গ্রাস' শুনে তাঁর মনে আবৃত্তির প্রতি প্রথম ভালোবাসা জন্মে।"[১৬] দরাজ ভরাট গলার অধিকারী ছিলেন তিনি। ছন্দজ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর আবৃত্তিতে একধরনের সুরেলা রেশ ছিল, সঙ্গীতের মতো মনে হতো তাঁর কবিতা আবৃত্তি। আবৃত্তির ইতিহাসে গোলাম মুস্তাফার কণ্ঠে 'বাংলা ছাড়ো' কবিতার আবৃত্তি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে লন্ডন ট্যাগোরিয়ানস-এর আমন্ত্রণে লন্ডনে আবৃত্তি করেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে সংগঠিত ১৪০০ সাল উদ্‌যাপন কমিটির আমন্ত্রণে এবং একই সময়ে আয়োজিত বাংলাদেশ বইমেলায় বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের কলকাতায় আবৃত্তি পরিবেশন করেন। প্রায় অর্ধশতক ধরে তিনি নিরলসভাবে আবৃত্তি পরিবেশন করেছেন, আবৃত্তির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। গোলাম মুস্তাফার আবৃত্তির ৫টি অডিও ক্যাসেট রয়েছে। ২০০৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ হাসান ইমাম (জ. ১৯৩৫)

সৈয়দ হাসান ইমাম ১৯৩৫ সালের ২৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজ, যাঁরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বর্জন করেন। স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের নাট্যবিভাগের প্রধানের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে খবরও পড়তেন। আবৃত্তিকার সংঘ এবং উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি ছিলেন। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে শিল্পী ও সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। 'ছায়ানট'-এর নববর্ষ পালনের সূচনাকারীদের অন্যতম তিনি। তাঁর একটি একক আবৃত্তির অডিও অ্যালবাম রয়েছে।

নরেন বিশ্বাস (১৯৪৫–১৯৯৮)

আবৃত্তিশিল্পী ও আবৃত্তি-বিশেষজ্ঞ নরেন বিশ্বাসের জন্ম ১৯৪৫ সালের ১৬ নভেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মাঝিগাতি গ্রামে। কঠিন বিষয়কে সহজ, প্রাণবন্ত ও সরস উপস্থাপনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই অলংকার, কাব্যতত্ত্ব, ব্যাকরণ কিংবা উচ্চারণের মতো নীরস বিষয়কেও তিনি শ্রোতাদের কাছে অনায়াস দক্ষতায় অসম্ভব প্রিয় করে তুলতে পারতেন। এক্ষেত্রে তাঁর দুর্দান্ত প্রক্ষেপণ শক্তির কণ্ঠস্বর পালন করতো সহযোগী ভূমিকা। শ্রেণীকক্ষে বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আবৃত্তি ছিল তাঁর পাঠদানের নিজস্ব ধরন। তাঁর স্মৃতিশক্তিও ছিল প্রখর। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং অন্যান্য আধুনিক কবির কবিতা তো বটেই; 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মতো গ্রন্থেরও সর্গের পর সর্গ ছিল তাঁর মুখস্থ।

নরেন বিশ্বাসের সবচেয়ে উলেখযোগ্য অবদান তাঁর 'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান'। তাঁর আর একটি অবিস্মরণীয় কাজ 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার' ক্যাসেটমালা। বাংলা সাহিত্যের সুনির্বাচিত অংশ নিয়ে তিনি 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার' শিরোনামে মোট ১১টি অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি স্বকণ্ঠে বাঙলা উচ্চারণ সূত্র, বাঙলা উচ্চারণবিষয়ক বক্তৃতামালা এবং প্রিয় পঙ্‌ক্তিমালা শীর্ষক একক আবৃত্তির ক্যাসেট প্রকাশ করে জাতিকে ঋণী করে গেছেন। তাঁর মহৎ কাজের জন্যে স্বদেশে কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না পেলেও 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার' ক্যাসেটমালার জন্যে তিনি কলকাতা থেকে ১৯৯৪ সালে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।[১৭] ১৯৯৮ সালের ২৭ নভেম্বর মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৯৪৬)

জন্ম সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে ১৯৪৬ সালে। ১৯৬২ সালে কলকাতায় লেখাপড়া করতে চলে যান। কলকাতায় সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে ইনস্টিটিউশনের এক আবৃত্তি অনুষ্ঠানে কাজী সব্যসাচীর উপস্থিতিতে 'বিদ্রোহী' কবিতার আবৃত্তি করে সব্যসাচীর প্রশংসা পেয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ শেষে ১৯৭২ সালে স্থায়ীভাবে খুলনায় ফিরে আসেন এবং গভীরভাবে আবৃত্তি চর্চা ও পরিবেশনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭৬ সালে খুলনায় 'বৃন্দ সমন্বিত শিল্পীসভা'র আয়োজনে একক আবৃত্তিসন্ধ্যা করেন। ১৯৭৭ সালে ঢাকার ওয়াপদা মিলনায়তনে একক আবৃত্তি অনুষ্ঠান করেন এবং একই বছর 'সমষ্টি'-র আয়োজনে জার্মান কালচারাল সেন্টারে বাংলাদেশে প্রথম দর্শনির বিনিময়ে একক আবৃত্তিসন্ধ্যা করেন। সত্তর ও আশির দশকে স্ত্রী মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ের সাথে সারাদেশে একক ও দ্বৈত আবৃত্তি করে আবৃত্তির জনপ্রিয়তাকে তুঙ্গে নিয়ে যান। তাঁর আবৃত্তি সম্পর্কে কামরুল হাসান মঞ্জুর অভিমত:

> গোলাম মুস্তাফার পর সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং আলোচিত আবৃত্তিশিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি একক প্রচেষ্টায়, সুনিপুণ দক্ষতায় আমাদের দেশে আবৃত্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন এবং যার আবৃত্তির মান শীর্ষস্থানীয় একটি অবস্থান ধারণ করে। সম্ভবত তিনিই প্রথম ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো একক আবৃত্তি অনুষ্ঠান করে আবৃত্তিকে একটি মর্যাদাসম্পন্ন শিল্প হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন।[১৮]

তাঁর বেশ কয়েকটি আবৃত্তির অডিও অ্যালবাম রয়েছে। এখন আবৃত্তির সাথে অভিনয়ে প্রবলভাবে যুক্ত রয়েছেন। 'মাটির ময়না'সহ অভিনয় করেছেন অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রে এবং টিভি নাটকে। আবৃত্তিশিল্পী হিসেবে তিনি কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, ডেট্রয়েট, ফ্লোরিডা, প্যারিসসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে আবৃত্তি পরিবেশন করেছেন। আবৃত্তি ও অভিনয়ের জন্য বহুবার পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছেন।

ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. ১৯৫২)

১৯৫২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি খুলনাতে ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাটকের ওপর পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। সাংবাদিকতা দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট (নিমকো)-এর পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ।

তিনি 'কথা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি। বাংলাদেশে আবৃত্তিশিল্পের প্রচারে এবং প্রসারে যে-মানুষগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯৭১ সালে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের শিল্পীদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

ইংল্যান্ড, রাশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর ও ভারতে আবৃত্তি পরিবেশন করেছেন। নিয়মিত আবৃত্তি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তাঁর নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য আবৃত্তি প্রযোজনা: ঐকতান, সোচ্চার শব্দাবলী, প্রতিরোধের উচ্চারণ, মুখোমুখি দাঁড়াবার দিন, শেষ বর্ষণ, নোটনের জন্য শোক, উচ্চারণগুলি শোকের, রাজা ইদিপাস, বিসর্জন, দেবতার গ্রাস, শিশুতীর্থ, বঙ্গ আমার জননী আমার ইত্যাদি। তাঁর বেশ কয়েকটি আবৃত্তির অ্যালবাম রয়েছে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'নাট্য: স্বর ও সংলাপ'। আবৃত্তিচর্চার জন্যে তিনি ২০২১ সালে একুশে পদক পেয়েছেন।

কামরুল হাসান মঞ্জু (জ. ১৯৫৬)

কামরুল হাসান মঞ্জুর জন্ম ১৯৫৬ সালে ফরিদপুরে। আবৃত্তি সংগঠন 'স্বরিত' এবং আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। আবৃত্তি স্কুল 'পাঠশালা' পরিচালনা করেছেন। আশির দশকে সফল নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি আবৃত্তিশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর কণ্ঠে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'লেনিন' কবিতার আবৃত্তি এদেশের আবৃত্তিশিল্পের অন্যতম মাইলফলক। তিনি ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৬ সালে ৩টি একক আবৃত্তি অনুষ্ঠান করেছেন।

তাঁর আবৃত্তির অনেকগুলো অডিও অ্যালবাম রয়েছে। আবৃত্তি বিষয়ে তিনি প্রচুর লেখালেখি করেছেন। শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি নিয়ে তাঁর বিশ্লেষাণাত্মক বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর রচিত আবৃত্তিবিষয়ক ভাবনার সংকলন 'বৃত্তের ওপারে ঝুমকো ফুল' গ্রন্থ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পরিবেশনা শিল্পকলা'-র আবৃত্তি অংশের রচয়িতা তিনি।

গণমাধ্যম পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা

বাংলাদেশের আবৃত্তিচর্চার উল্লেখযোগ্য ধারা গণমাধ্যম পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চা। বেতার, টেলিভিশন, অডিও-ভিডিও অ্যালবাম, বই-পত্রিকা ইত্যাদি গণমাধ্যম কখনো আবৃত্তি, কখনো আবৃত্তির সংবাদ প্রচার, আবার কখনো আবৃত্তির কলাকৌশল বা আবৃত্তির গঠনমূলক সমালোচনা করে আবৃত্তিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে।

বেতার

গণমাধ্যম পর্যায়ে আবৃত্তিচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে বাংলাদেশ বেতার। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই ভূখণ্ডের আবৃত্তি ঢাকা বেতার কেন্দ্রভিত্তিক হয়ে পড়ে। পঞ্চাশের দশকেও বেতারে অত্যন্ত উঁচু মানের আবৃত্তি প্রচার হয়েছে। তখন নানাজনের সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ কবিতার শিল্পসম্মত আবৃত্তি শ্রোতাদেরকে আবিষ্ট করে রাখত। ষাটের দশকে বেতারে আশরাফুল আলম, আশফাকুর রহমান খান, হাসান ইমাম, আলেয়া ফেরদৌসী, হাসি চক্রবর্তী প্রমুখ আবৃত্তি করেছেন। সত্তরের দশকে যাঁদের আবৃত্তিতে বেতার সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে শফি কামাল,

দিলওয়ার হাসান, আবদুল্লাহ আল ফারুক, কাজী হোসনে আরা, কাজী আরিফ, প্রজ্ঞা লাবণী, শাকিব লোহানী, সালেহ আকরাম, রায়হান গফুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১৯]

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরিবেশিত অনুষ্ঠানসমূহ জাতীয় জাগরণের সঞ্জীবনী হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন 'সাহিত্য আসর' প্রচারিত হতো। এখানে 'রক্তস্বাক্ষর' বিভাগে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন।[২০] স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখা' প্রচারিত হতো। এই অনুষ্ঠানে প্রতিদিন আবৃত্তি প্রচারিত হতো।[২১]

স্বাধীনতা-উত্তরকালেও বাংলাদেশ বেতার আবৃত্তির প্রসারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকা বেতারের সান্ধ্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'উত্তরণ' ১৯৭৫ সালের ১ ডিসেম্বর প্রচার শুরুর দিন থেকেই আবৃত্তি প্রসারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।[২২] আবৃত্তি ছাড়াও পাঠ এবং উচ্চারণরীতিও 'উত্তরণ'-এ প্রচারিত হয়েছে। উচ্চারণসূত্রগুলো বলতেন অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস এবং প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিতেন আশরাফুল আলম। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের শুধু আবৃত্তি নিয়ে প্রচারিত অনুষ্ঠানটির নাম 'বাণী ও ছন্দ'। অনুষ্ঠানটির প্রযোজনায় ছিলেন দিলওয়ার হাসান এবং পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিলেন আশরাফুল আলম।

টেলিভিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহিদ দিবস, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ইত্যাদি বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানসমূহে আবৃত্তি পরিবেশিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইতিহাসে সবচেয়ে দর্শকনন্দিত এবং গুরুত্বপূর্ণ আবৃত্তিবিষয়ক অনুষ্ঠান ছিল 'ছন্দবৃত্ত'। প্রজ্ঞা লাবণীর অসামান্য উপস্থাপনায় পঞ্চাশ মিনিটের এই আবৃত্তিবিষয়ক অনুষ্ঠানে আবৃত্তির সমালোচনা, একক-দ্বৈত-বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশিত হয়েছে এবং আবৃত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন বিরতির পরে ১৯৯৪ সালে আবার 'ছন্দবৃত্ত'-এর মাসিক প্রচার শুরু হয় এবং কয়েকটি প্রান্তিক চলে।[২৩]

বিটিভি-তে জানুয়ারি ১৯৯৮ থেকে প্রচারিত হওয়া শুরু করে ২৫ মিনিটের মাসিক আবৃত্তির অনুষ্ঠান 'দৃপ্ত উচ্চারণ'। বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের প্রচেষ্টায় চালু হওয়া এই অনুষ্ঠানের পরিচালনায়ও ছিল বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ। এটির সমন্বয় করেছেন শিমুল মুস্তাফা, আহ্কাম উল্লাহ্ এবং আজহারুল হক আজাদ। উপস্থাপনা করতেন আহ্কাম উল্লাহ। প্রযোজনায় ছিলেন সৈয়দ জামান। প্রতিমাসের দ্বিতীয় শুক্রবার অনুষ্ঠানটি প্রচার হতো। প্রথম মাসের বিষয় ছিল: প্রেম, আর দ্বিতীয় মাস ছিল ফেব্রুয়ারি, তাই বিষয় নির্ধারিত হয়েছিল: ভাষা আন্দোলন। এই অনুষ্ঠানে একক, দ্বৈত ও দলীয় পরিবেশনা ছিল। অনুষ্ঠানটির প্রথম প্রযোজক ছিলেন কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী। বর্তমানে 'দৃপ্ত উচ্চারণ' অনুষ্ঠানটির কাঠামো ও বিষয় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে 'সুবর্ণ উচ্চারণ' নামে প্রচারিত হচ্ছে। নাম বদলের সাথে সাথে উপস্থাপক ও প্রযোজকও পরিবর্তিত হয়েছে এই অনুষ্ঠানের।

অডিও ক্যাসেট-সিডি-ভিসিডি-ডিভিডি

আবৃত্তি শিল্পমাধ্যমটিকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছে আবৃত্তির অডিও অ্যালবাম। বৃহত্তর জনমানুষের কাছে আবৃত্তিকে পৌঁছে দিয়ে আবৃত্তি বিকাশে এই অ্যালবামগুলো পালন করেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং শিল্পসুষমামণ্ডিত শব্দ-বাক্যের উচ্চারণে আপ্লুত করেছে অনুরাগীদের।

এদেশের আবৃত্তিকারদের মধ্যে প্রথম আবৃত্তির অডিও অ্যালবাম প্রকাশের গৌরব কাজী আরিফের। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৬টি কবিতার আবৃত্তি নিয়ে 'পত্রপুট' শীর্ষক ক্যাসেট প্রকাশের মধ্য দিয়ে এই শুভ সূচনা হয়। 'পত্রপুট' প্রযোজনা করেছিলেন ঢাকা বেতারকর্মী নাসিরউদ্দীন ভূঁইয়া। ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম আবৃত্তির অ্যালবাম 'প্রাণে বাজায় বাঁশি' প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। এরপর 'ঐকতান'সহ তাঁর মোট ৬টি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তির অ্যালবাম প্রথম বাজারে আসে ১৯৮৬ সালে। একই সময়ে তাঁর দুটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছিল: 'আত্মপ্রকাশ' একক এবং 'দ্বিতীয়া' দ্বৈত। তাঁর মোট অ্যালবামের সংখ্যা ৯টি। কামরুল হাসান মঞ্জুর প্রথম আবৃত্তির অ্যালবাম 'প্রসূনের জন্য প্রার্থনা' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। দ্বিতীয় অ্যালবাম 'অর্জুন শুধু অর্জুন' প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। তাঁর মোট অ্যালবামের সংখ্যা ১৩টি। শিমুল মুস্তাফার অ্যালবাম সংখ্যা ৪০। তাঁর প্রথম আবৃত্তির অ্যালবাম 'হৃদয় পানে হৃদয় টানে' বের হয় ১৯৮৬ সালে। প্রথিতযশা আবৃত্তিকার গোলাম মুস্তাফার আবৃত্তির ৫টি অডিও ক্যাসেট রয়েছে। তাঁর একজোড়া আবৃত্তির অডিও ক্যাসেট বের হয় বাংলা একাডেমির বইমেলায় ১৯৯১ সালে। মাহিদুল ইসলামের একক ও দ্বৈত মিলে ৬০টি অ্যালবাম রয়েছে।

একসময় বেতারজগৎ, কমিটমেন্ট প্রডাক্টস, ডন মিউজিক, সংগীতা, সাউন্ডটেক, ঝংকার ইলেকট্রনিক্স, ইউসুফ ইলেকট্রনিক্স প্রভৃতি রেকর্ডিং কোম্পানি আবৃত্তির অ্যালবাম প্রকাশে বেশ উৎসাহ দেখাতো। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে আবৃত্তির অ্যালবাম প্রকাশ প্রায় ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

বই-পত্রিকা

আমাদের দেশ থেকে আবৃত্তিবিষয়ক বেশকিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বইগুলো আবৃত্তিশিক্ষার্থীকে আবৃত্তির ইতিহাস, আবৃত্তির গুরুত্ব, আবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়: কণ্ঠস্বর সাধনা, শুদ্ধ উচ্চারণ, ছন্দ, আবেগ, রস, অভিব্যক্তি ও প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়ে তাকে আবৃত্তিশিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে। আর আবৃত্তি-বিষয়ক পত্রিকা আবৃত্তির জন্য সহায়ক ভূমিকা নিয়ে আবৃত্তির সংবাদ প্রচার করে এবং আবৃত্তির গঠনমূলক সমালোচনা করে আবৃত্তিশিল্পের অগ্রগামিতায় ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রথম তিনটি আবৃত্তিবিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ হলো:

খসরু চৌধুরী: *আবৃত্তিকলা*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৯

নাসিম আহমেদ: *আবৃত্তি প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

নিমাই মণ্ডল: *আবৃত্তির কলাকৌশল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬

এরপর আরও অনেক আবৃত্তিবিষয়ক বই বের হয়েছে, বড়দের ও ছোটদের আবৃত্তির কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো বইয়ে আবৃত্তিবিষয়ক সীমিত আলোচনার সাথে বহুলাংশ জুড়ে আবৃত্তির কবিতা রয়েছে। এইসমস্ত গ্রন্থ বাজারে পাওয়া গেলেও এর অধিকাংশই ২০০০ সালের পরে প্রকাশিত।

আবৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম কোনো পত্রিকা প্রকাশ করে চট্টগ্রামের 'বোধন আবৃত্তি পরিষদ'। ১৯৯২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি 'আবৃত্তি' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের শুরু। অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত 'আবৃত্তি' পত্রিকার এ পর্যন্ত ছয়টি সংখ্যা বের হয়েছে। 'আবৃত্তি'-র বিগত সংখ্যাগুলোতে আবৃত্তি বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকারসহ অনুষ্ঠানের খবর, আবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ইত্যাদির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের আবৃত্তিচর্চার বিকাশে মাসুদ সেজান সম্পাদিত 'আবৃত্তিলোক' (১৯৯৮) পত্রিকা এক উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র নাম। মে ২০০৪ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির মোট সাঁইত্রিশটি সংখ্যা বের হয়েছে। *আবৃত্তিলোক*-এর আগে বাংলাদেশ থেকে আর কোন আবৃত্তি-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। আবৃত্তির অনুষ্ঠান, আবৃত্তির আলোচনা, সাক্ষাৎকার, কর্মশালা, সেমিনার, আবৃত্তিগ্রন্থ সমালোচনা, আবৃত্তি সংগঠনের পরিচিতি, আবৃত্তির জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়: ছন্দ-উচ্চারণ-কণ্ঠস্বর-অভিব্যক্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও মূল্যায়ন *আবৃত্তিলোক*-এর গৌরব বৃদ্ধি করেছে এবং আবৃত্তিকার ও আবৃত্তি-অনুরাগীদেরকে সমৃদ্ধ করেছে।

এমনিভাবে নানাধারায় বিবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সতত বিকশিত হচ্ছে আমাদের আবৃত্তিশিল্প, যার মধ্য দিয়ে কবিতার অন্তর্নিহিত বক্তব্য শ্রোতা ও পাঠকের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হচ্ছে। আর শুদ্ধ-পরিমার্জিত উচ্চারণ ও শৈল্পিক রুচিবোধের প্রসারে, সারাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আবৃত্তি আমাদের সমাজে ইতিবাচক ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. নাসিম আহমেদ, *আবৃত্তি প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ২৩৭

২. কামরুল হাসান মঞ্জু ও জাহিদুল ইসলাম, 'আবৃত্তি', *পরিবেশনা শিল্পকলা*, ইসরাফিল শাহীন সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ৪৯৯

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০০

৪. *আবৃত্তি প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮

৫. 'আবৃত্তি', *পরিবেশনা শিল্পকলা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০০

৬. বিক্ষুব্ধ শিল্পীসমাজের আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমামের বক্তব্য, *চারুকণ্ঠ আবৃত্তি সংসদের আঠার বছর পূর্তি অনুষ্ঠান*, ১৭ নভেম্বর ২০১২, বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা

৭. সন্‌জীদা খাতুন, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০), পৃ. ৩৮

৮. গোলাম সারোয়ার, 'আবৃত্তির ক্রমধারা এবং সম্ভাবনা', *আবৃত্তি বিষয়ক প্রবন্ধমালা*, আমিনুর রহমান সম্পাদিত (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১০), পৃ. ৭২

৯. *আবৃত্তি প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

১০. *তদেব*

১১. কামাল লোহানী, 'আবৃত্তির সেকাল-একাল', *প্রতিষ্ঠার আঠার বছর* স্মরণিকা (ঢাকা: চারুকণ্ঠ আবৃত্তি সংসদ, ২০১২), পৃ. ১১

১২. ফয়জুল আলম পাপ্পু, *আবৃত্তি শিক্ষণ*, (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১০), পৃ. ২৪

১৩. মীর বরকত, *আবৃত্তির ক্লাস*, (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ১২

১৪. 'কথোপকথন– ১', *গোলাম মুস্তাফা: কর্ম ও জীবন*, ইকবাল খোরশেদ সম্পাদিত (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ২১

১৫. মীর বরকত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

১৬. 'কথোপকথন ১', *গোলাম মুস্তাফা: কর্ম ও জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৭. নিমাই মণ্ডল, 'নরেন বিশ্বাস: স্মৃতিতে অম্লান', *দৈনিক সমকাল*, গোলাম সারোয়ার সম্পাদিত, ২৭ নভেম্বর ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৪

১৮. কামরুল হাসান মঞ্জু, *বৃত্তের ওপারে ঝুমকো ফুল*, (ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৯) পৃ. ৫৬

১৯. গবেষককে আবৃত্তিশিল্পী এবং বাংলাদেশ বেতারের প্রাক্তন প্রযোজক দিলওয়ার হাসান প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, বাংলাদেশ বেতারভবন, আগারগাঁও ঢাকা, বেলা ৪টা, ১৫.৯.২০১২

২০. বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃ. ১১৫

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

২২. নিমাই মণ্ডল, *আবৃত্তির কলাকৌশল* (ঢাকা: শোভাপ্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৫

২৩. *তদেব*, পৃ. ১৮